বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৫: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পর্যালোচনা

প্রতি বছরের মতো ২০১৫ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পর্যালোচনা আপনাদের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের কাছে তুলে ধরছি। দেশের বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিষয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে গেলে মানবাধিকারকে দু'টি ভাগে দেখা যায়। এই দুই ভাগের মধ্যে– একটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অপরটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। ২০১৫ সালে মানবাধিকারের অন্যতম সূচক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থার (এফএও) 'দ্য স্টেট অব ফুড সিকিউরিটি ইন ওয়ার্ল্ড - ২০১৫' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ বছর জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পূরণের ক্ষেত্রে কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে সফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে, যা বিশ্বব্যাংক স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত স্থল-সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ ছিল ২০১৫ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর মাধ্যমে ভিনদেশের জঠর থেকে মুক্ত হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের ১৬২ টি ছিটমহল। অন্যদিকে মানবাধিকারের আরেকটি সূচক; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও এ ক্ষেত্রেও কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে– ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৫, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন-২০১৫, বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন-২০১৫, শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন এবং গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন প্রভৃতি। অন্যদিকে বিগত বছরগুলোর ধারবাহিকতায় এ বছরেও ৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ পর্যন্ত মোট ২১টি রায় প্রদান করেছে। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে ৫টি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে ৩টি মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান সরকারের প্রশংসিত একটি সিদ্ধান্ত।

এতদসত্ত্বেও ২০১৫ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। ৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে বিএনপির মহাসমাবেশে সরকারের বাধা ও তৎপরবর্তী বিএনপি-জামায়াত জোটের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। একটানা দু'মাসেরও অধিক সময়জুড়ে এই অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে দেশব্যাপী যানবাহনে ব্যাপক পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ ও নাশকতাসহ নানাবিধ রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় হতাহতের শিকার হন দেশের সাধারণ মানুষ। একই সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজনৈতিক সহিংসতা দমনের নামে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক অপহরণ, গুম, গুপ্তহত্যা, ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড; যা বছরজুড়ে অব্যাহত ছিল। এছাড়া বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালেও বিনা বিচারে আটক, গণগ্রেফতার এবং বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালে মানবসৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে সাগরপথে মানবপাচার এবং থাই-মালেশীয় সীমান্তের গভীর জঙ্গলে অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশী শ্রমিকের গণকবর আবিষ্কার ও কঙ্কাল উদ্ধারের ক্ষেত্রে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর ন্যায় ২০১৫ সালেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন; বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির, প্রতিমা ও বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর এবং তাদের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা অব্যাহত ছিল। এছাড়া খ্রিষ্টান ধর্মযাজক হত্যা প্রচেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকির ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে ধর্মীয় উগ্রপন্থার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার প্রবণতা ছিল ২০১৫ সালের আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। বিভিন্ন জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর নামে দেশের এবং বিদেশী নাগরিককে হত্যা ও হুমকি প্রদান, ঢাকার হোসেনী দালানে বোমা হামলা ও বগুড়ায় শিয়া মসজিদে গুলিবর্ষনের ঘটনায় হতাহত এবং রাজশাহীতে আহমদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হওয়ার ঘটনা আমাদের মনে গভীর শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরেও ঘটেছে নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনা। বর্ষবরণ উৎসবে যোগ দিতে এসে পুলিশের উপস্থিতিতে নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পায় নৃশংস শিশুহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে চলতি বছরের চিত্র ছিল উদ্বেগজনক। একদিকে মুক্তমনা লেখক-প্রকাশককেরা হামলা এবং নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে আইনি ও প্রশাসনিকভাবে ভিন্নমতকে রুদ্ধ করার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে বছরের বিভিন্ন সময়ে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ফেসবুক, ভাইবার, হোয়াটস অ্যাপসহ ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩) এর ৫৭ ধারা ব্যবহার করে মানুষকে হয়রানি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। সভা-সমাবেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এ চিত্র ছিল

দুর্ভাগ্যজনক। বিরোধী দলগুলোকে কার্যত কোনো সভা-সমাবেশই করতে দেয়া হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেফতার, জামিন না দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। বর্ষবরণ উৎসবে নারীদের যৌন হয়রানীর প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশ, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, প্রশ্ন-ফাঁসের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ, আদিবাসীদের ভূমিরক্ষার আন্দোলন, সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন অথবা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় আয়োজিত শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ–প্রায় সবকিছুকেই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৫-এর সেপ্টেম্বরে টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে মা-ছেলেকে বর্বর নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদে পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং গুলিবর্ষণে চারজন সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনাটি ছিল নজিরবিহীন। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র গুলিবর্ষণে হতাহতের ঘটনাও মানুষ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

২০১৪ সালের মত ২০১৫ সালও শুরু হয় রাজনৈতিক সহিংসতা দিয়ে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি প্রধান বিরোধী দলসমূহের বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেই নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবিতে ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি সমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি দেয় বিএনপিসহ ২০দলীয় রাজনৈতিক জোট। সরকারের পক্ষ থেকে সেই কর্মসূচি পালনের অনুমতি না দিয়ে বিএনপি নেত্রীকে তার কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্ভাব্য নাশকতা এড়ানোর জন্যই সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি এবং বিএনপি নেত্রীকে সমাবেশে যেতে দেয়া হয়নি। এর পরদিন থেকেই সারাদেশে শুরু হয় বিরোধী দলের ডাকা লাগাতার অবরোধ এবং একই সঙ্গে নাশকতা। টানা দুই মাসের অধিক সময় ধরে চলে এই অবরোধ। অবরোধ চলাকালীন যানবাহনে পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান কমপক্ষে ৭০ জন। এসব হামলা থেকে রক্ষা পায়নি নারী-শিশু-বৃদ্ধ। হামলা হয়েছে স্কুলে, পাঠ্যপুস্তকবাহী গাড়িতে। নিহত ও আহতদের প্রায় প্রত্যেকে ছিলেন সাধারণ মানুষ, বেশিরভাগই দরিদ্র বাস-ট্রাকের চালক ও সহকারী– যাদের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সংশ্রব ছিলনা।

২০১৫ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ, ক্ষমতাসীন দলের সাথে বিরোধীদল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ মোট ৮৬৫টি রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব রাজনৈতিক সংঘাতে মোট ১৫৩ জন নিহত ও ৬৩১৮ জন আহত হন। নিহতদের মধ্যে ৯২ জন ছিলেন সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ৬৬৪টি সংঘাতের ঘটনায় ১৪৭ জন নিহত হয়েছিলেন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু

২০১৫ সালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, গুলিবিনিময় ও এনকাউন্টারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, গুলিবিনিময় এবং হেফাজতে মোট ১৯২ জন নিহত হন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ১২৮। ২০১৫ সালে গ্রেফতারের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে শারীরিক নির্যাতনে মারা যান ৬ জন, গ্রেফতারকালীন সময়ে মারা যান ৫ জন এবং গ্রেফতারের পর আত্মহত্যা করেন ৩ জন। এ বছর কারা হেফাজতে মোট মারা যান ৬৮ জন, যার মধ্যে হাজতী ছিল ৪২ জন এবং কয়েদী ছিল ২৬ জন। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে আটককৃতদের পায়ে গুলি এবং এর ফলে স্থায়ী পঙ্গুত্ববরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে বছরের বিভিন্ন সময়ে। ভিকটিম এবং তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক গুলি করার অভিযোগ পাওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি বরাবরের মতই অস্বীকার করেছে। তবে কয়েকটি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১২ জানুয়ারি সকাল ৮.৩০ টার দিকে রাজধানীর দক্ষিণখান থানার মধ্য আজমপুর এলাকায় জনসমক্ষে হাজি ফায়েজ আলী নামক স্থানীয় ব্যবসায়ীকে গুলি করে পুলিশ। এ ঘটনায় ফায়েজ আলীর পরিবার থানায় মামলা করতে না পেরে আদালতে অভিযুক্ত এসআই জয়নালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ২ ফেব্রুয়ারি মিরপুরের ১১ নং সেক্টরের মোঃ নাহিদকে পল্লবী থানা পুলিশের সিভিল টিম সোর্সের মাধ্যমে ডেকে নিয়ে আটক করে। পরিবারের সদস্যরা আসক প্রতিনিধিদের জানান, নাহিদকে আটক করার পর তাদের কাছে ৫ লাখ টাকা দাবি করে পুলিশ। টাকা দিতে না পারায় পুলিশের পক্ষ থেকে কোর্টে চালানের কথা বলা হলেও ৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশ আটকের কথা অস্বীকার করে। থানা ও কোর্টে নাহিদের কোনো সন্ধান না পেয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি মিরপুর বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন তার পরিবার। এরপর ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নাহিদের লাশ শনাক্ত হয়। এ ঘটনায়ও ভিকটিম পরিবার আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন।

গুম-গুপ্তহত্যা

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত অনেকেরই খোঁজ পাওয়া যায়নি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গুম হওয়ার পর লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোয় গুম বা গুপ্তহত্যা বিষয়ে প্রকাশিত খবরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ সালে এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছেন মোট ৫৫ জন। এর মধ্যে

পরবর্তী সময় ৮ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে, ৭ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, পরিবারের কাছে ফেরত এসেছেন ৫ জন এবং বাকিদের এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ মেলেনি। অধিকাংশ ঘটনায় অপহৃত, নিখোঁজ বা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষত র‍্যাব ও ডিবি'র বিরুদ্ধে এসব ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুললেও সাধারণত এ ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রেস নোট প্রদান বা কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব স্বীকারসহ গুম বা গুপ্তহত্যা রোধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা কিংবা তদন্ত কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। তবে ২০১৪ সালে নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব কর্তৃক সাত গুম-খুন মামলার প্রধান আসামি নূর হোসেনকে ভারত থেকে এ বছর দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যা ওই ঘটনার বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ।

২০১৫ এর ১২ জুলাই ঢাকার মোহাম্মদপুরের তাজমহল সড়কে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মাইক্রোবাস থেকে ডিবি পরিচয়ে ধরে নিয়ে যায় পল্লবী থানাধীন কালশি এলাকার মমিন বক্স নামক এক ব্যক্তি ও তাঁর ড্রাইভারকে। পরদিন ড্রাইভারকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মমিন বক্সের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। চারদিন পর কালশির বাউনিয়া বাঁধ সড়কের একটি সেতুর নিচে মমিন বক্সের লাশ পাওয়া যায়।

গণপিটুনি

২০১৪ সালে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছিল ১২৩ জন। ২০১৫ সালে তা দাড়িয়েছে ১৩৫ জনে। এ বছরের ১০ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ডাকাত সন্দেহে স্থানীয় জনগণ ৮ জনকে পিটিয়ে হত্যা করে। ২৫ আগষ্ট অপহরণকারী সন্দেহে পাবনায় গণপিটুনিতে নিহত হন তিন ব্যবসায়ী। অন্যদিকে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর কাজীপাড়ায় তিন তরুন গণপিটুনিতে নিহত হওয়ার বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও আসক তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ওই এলাকায় গণপিটুনির কোন ঘটনা ঘটেনি। তাছাড়া পুলিশের সুরতহাল প্রতিবেদনে তিন তরুনের দেহে ৫৪টি গুলির দাগ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে জনগণ আইন হাতে তুলে নিয়ে গণপিটুনির ঘটনা ঘটায়; অন্যদিকে জনগণের মধ্যেও অসহিষ্ণু মনোভাব ক্রমেই বাড়ছে। আমরা মনে করি, জনগণের হাতে আইন তুলে নেয়ার এসব ঘটনা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

মানবপাচার ও অভিবাসী শ্রমিক

এ বছর মানবপাচারের এক ভয়াবহ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে আমাদের সামনে। সাগরপথে নৌকা, জাহাজ বা ট্রলারে করে মালেশিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন অভিবাসন প্রত্যাশী অসংখ্য মানুষ। এছাড়া থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া সীমান্তের গহীন অরণ্যে বাংলাদেশী নাগরিক ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অভিবাসীদের গণকবরের সন্ধান, মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পে আটকে রেখে পাচারকারী ও দালালদের নির্মম নির্যাতন ও মৃত্যু, গভীর সমুদ্রে দালালদের অত্যাচার-নির্যাতন এবং নৌকা থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া, ভাসমান ক্ষুধার্ত রোগাক্রান্ত মৃতপ্রায় মানুষদের ছবি, ইন্দোনেশিয়ার আচেহ উপকূলের কাছাকাছি দরিয়ায় খাবার নিয়ে ক্ষুধার্তদের মারামারিতে শতাধিক মানুষের প্রাণহানীর খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আসক-এর তথ্যানুসন্ধানকালে পাচারের শিকার অনেকেই জানিয়েছেন, অপহরণের পর তাদেরকে জোর করে অন্যান্যদের সাথে নৌকায় তুলে দেওয়া হয়। পরে বিভিন্ন বন্দিশিবিরে আটকে রেখে পাচারকারীরা তাদেরকে দিয়ে বাড়িতে ফোন করিয়ে মুক্তিপণ চায়। মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পাচারকারী ও দালালদের নির্যাতনে অনেক বন্দির মৃত্যু হয়েছে। এমনকি মুক্তিপণ দেওয়ার পরও মেরে ফেলার খবর পাওয়া গেছে। এসব খবর আমাদের সামনে এই বাস্তবতা হাজির করে যে, বৈধ ও সুগম পথে বিদেশে যাবার সরকারি উদ্যোগের স্থবিরতার কারণে বাংলাদেশের বেকার, ভাগ্যান্বেষী মানুষরা দালালদের প্রলোভনে পড়ে ও অপহরণের শিকার হয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে ও অবৈধভাবে পাচারের শিকার হচ্ছেন। ইউএনএইচসিআরের এপ্রিল মাসের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১৫ সালের প্রথম তিনমাসেই অন্তত ২৫ হাজার মানুষ পাচারের শিকার হয়। এর মধ্যে অন্তত ৫৪০ জন মারা গেছেন। ২০১২ সালে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন প্রণীত হলেও এ আইনে দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যায়। সরকার মানবপাচার প্রতিরোধে ত্রিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী সাত বিভাগে বিশেষ ট্রাইবুনাল করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত গঠিত হয়নি। অন্যদিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হলেও বাস্তবে এ আইনের কার্যকর প্রয়োগ খুবই কম।

মতপ্রকাশের অধিকার

সরকারের বিভিন্ন দমনমূলক পদক্ষেপ কিংবা ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর অপতৎপরতা– উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। ব্লগে লেখালেখির মাধ্যমে নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর হামলায় প্রাণ দিতে হয়েছে লেখক অভিজিৎ, ওয়াশিকুর, অনন্ত বিজয় ও নিলাদ্রী এবং অভিজিতের বইয়ের প্রকাশক দীপনকে। এছাড়া হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে ব্লগে লেখালেখির সাথে জড়িত অনেককেই। ২৬ ফেব্রুয়ারি বইমেলা থেকে ফেরার পথে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ

রায়কে। তার স্ত্রী ও সহ-লেখক রাফিদা আহমেদ বন্যাও মারাত্মকভাবে জখম হন। অভিজিৎ রায়ের হত্যাকাণ্ডের স্থান আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নাগালের বাইরে ছিল না, হামলার সময় কাছেই পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তারা তড়িৎ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। এরপর ৩০ মার্চ ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ওয়াশিকুর রহমানকে ও ১২ মে সিলেটের অনন্ত বিজয় দাসকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় হত্যাকারীরা। ৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে রাজধানীর খিলগাঁওয়ের ভাড়া বাসায় ঢুকে নীলাদ্রী চট্টোপাধ্যায়কে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। সর্বশেষ ১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অভিজিতের প্রকাশক জাগৃতি'র দীপনকে আজিজ সুপার মার্কেটের কার্যালয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। সেই সাথে একই দিনে লালমাটিয়ার 'শুদ্ধস্বর' প্রকাশনা কার্যালয়ে ঢুকে দুর্বৃত্তরা হত্যার উদ্দেশ্যে টুটুলসহ তিনজনকে গুরুতর আহত করে।

এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রতিথযশা লেখক-বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংগঠনের ওপর অব্যাহতভাবে হামলা ও হত্যার হুমকির ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, ব্লগার রাজীব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন

বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০১৫ সালেও দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ওপর ব্যাপক হামলা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, এবং তাদের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা অব্যাহত ছিল। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০১৫ সালে সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১০৪টি বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং মন্দির উপাসনালয় ও প্রতিমা ভাংচুরের ২১৩টি ঘটনা ঘটে। এছাড়া আক্রমণের শিকার হয়েছেন খ্রিস্টান, বাহাই, শিয়া ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন। এসব ঘটনার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দায়িত্বশীল পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি।

২০১৫ সালের ১৩ মার্চ বরগুনার তালতলী উপজেলায় ৯টি হিন্দু পরিবার উচ্ছেদের শিকার হয়। উল্লেখ্য বিগত দুই বছরে ঐ একই এলাকা থেকে আরও ৫টি পরিবার উচ্ছেদের শিকার হয়েছিল। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে তথ্যানুসন্ধান করে এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট আবেদন করলে হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে উচ্ছেদকৃত মোট ১৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন করাসহ প্রাথমিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এছাড়া বগুড়ার পালপাড়ায়, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ও পার্বতীপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনা ঘটে। চাঁদা না দেওয়ায় ২৮ অক্টোবর একদল দুর্বৃত্ত হামলা করে ফেনী সদর উপজেলার মাথিয়ারা গ্রামের জেলেপাড়ায়। ঘটনার সময় সন্ত্রাসীরা ৬ মাসের এক অন্ত:স্বত্তা নারীর পেটে লাথি দিলে তার গর্ভপাত ঘটে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নবজাতক শিশুটি মারা যায়। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আরও অনেক নারী-পুরুষ আহত হন। ৫ ডিসেম্বর দিনাজপুরের ঐতিহাসিক কান্তজিউর মন্দিরের পাশ্ববর্তী রাসমেলায় বোমা হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হন এবং একই জেলায় ১০ ডিসেম্বর ইসকন মন্দিরে ঘটে গুলিবর্ষনের ঘটনা। ১০ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গায় হত্যা করা হয় সাধুসঙ্গের এক বাউলকে।

২৫ ডিসেম্বর রাজশাহীর বাগমারায় আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলায় একজন নিহত ও ১০জন আহত হন। ২৩ অক্টোবর দিবাগত রাতে ঢাকার হোসেনী দালানে বোমা বিস্ফোরণে দুজন নিহত ও শতাধিক আহত হন এবং ২৬ নভেম্বর বগুড়ায় শিয়া মসজিদে গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত হন মসজিদের মুয়াজ্জিন।

সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন

বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০১৫ সালেও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি কোনো কাজে আসেনি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও এ ধরনের ঘটনা নিরসনের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারেনি। বহুল আলোচিত ফেলানী হত্যা মামলায় বিএসএফ-এর আদালত কর্তৃক পুর্নবিবেচিত রায়ে ন্যায় বিচার পায়নি তার পরিবার। যদিও মানবাধিকার সংগঠনের সহযোগিতায় এ বছরের ১৪ আগস্ট ফেলানীর বাবা ভারতের সুপ্রীম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর এবং আসক'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ সালে সীমান্তে হত্যা ও নির্যাতন সহ মোট ২০৯টি ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে হত্যার শিকার হন ৩২ জন, শারীরিক নির্যাতনে নিহত হন ১৪ জন এবং আহত হন ৭৩ জন। এছাড়া সীমান্ত থেকে অপহরণের শিকার হয়েছেন ৫৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক।

নারী নির্যাতন

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা ও প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন নারীরা। বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৫ সালেও নারী উত্যক্তকরণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন ও গৃহকর্মী নির্যাতনসহ নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে। দেশের নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অব্যাহত বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে মামলা হলেও মূলত বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে ভিকারুননেছা নুন স্কুলের ছাত্রী ধর্ষণের মামলার আসামী

শিক্ষক পরিমল জয়ধরের যাবজ্জীবন শাস্তির রায় এ বছর প্রদান করা হয়; যা বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হয়েছে।

অন্যদিকে তালাকনামায় স্বাক্ষর না করায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এক গৃহবধূকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মা-মেয়েকে পেট্রোল ছুড়ে পুড়িয়ে হত্যা, বরিশালে গৃহবধূকে ২২ দিন ঘরে আটকে রেখে নির্যাতনের ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য।

উত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন

২০১৫ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন ও বখাটে দ্বারা উত্যক্তকরণের ঘটনা বেড়েছে। ২০১৫ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন মোট ২২৪ জন নারী। এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১০ জন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় খুন হয়েছেন ৬ জন, বখাটেদের প্রতিবাদ করায় লাঞ্ছিত হয়েছেন ২০৫ জন নারী এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে ৪ জন মেয়ের। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন মোট ১৪৬ জন নারী। এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি এলাকায় কতিপয় বখাটে কর্তৃক কয়েকজন তরুণীর যৌন হয়রানির শিকার হওয়া। যেখানে পুলিশ উপস্থিত থেকেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। বর্ষবরণে নারী লাঞ্ছনার বিচার চাইতে এসে উল্টো লাঞ্ছিত হয়েছে ছাত্রীরা। পুলিশের লাথি ঘুষি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় কয়েকজন ছাত্রীকে। এছাড়া ১৮ আগস্ট সিরাজগঞ্জের তাড়াশে মেয়েকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদে বখাটেরা হত্যা করে তার মাকে। অপরদিকে ২৬ আগস্ট মাদারীপুরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বখাটে দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় এক স্কুলছাত্রী আত্মহত্যা করেন।

ধর্ষণ

২০১৫ সালে ৮৪৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ৬০ জনকে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেন ২ জন। যেখানে ২০১৪ সালে ৭০৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হন। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ৬৮ জনকে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ১৩ জন। ৬ জানুয়ারি রাজবাড়ী পাংশায় সরিষা ইউনিয়নের আদিবাসী এক নারী ও তার মেয়ে ধর্ষণের শিকার হন। অন্যদিকে যশোরের কেশবপুরে এক বাক-প্রতিবন্ধী নারী এবং ঢাকায় আদিবাসী গারো তরুণী চলন্ত মাইক্রোবাসে ধর্ষণের শিকার হন। এছাড়া কোনো কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষণের সময় ধারণকৃত ভিডিও চিত্র ইন্টারনেটে ছড়ানোর হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি এবং ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ভিডিও চিত্র প্রকাশের প্রবণতা দেখা গেছে।

সালিশ ও ফতোয়া

বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৫ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা কমেছে। আসকের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের হিসেব মতে ২০১৫ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে মোট ১২ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে ৩টি। কিন্তু ২০১৪ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন ৩২ নারী। ১৫ অক্টোবর বরিশালে সালিশের নামে এক গৃহবধূকে জুতাপেটা করা হয়। সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ধর্ষণ মামলা আপোষ না করায় ধর্ষিতার পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়। রাজশাহীতে সালিশের মাধ্যমে আদিবাসী নারীকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয় এবং বগুড়ায় হিল্লা বিয়েতে রাজি না হওয়ায় যুবতীর পরিবারকে একঘরে করা হয়েছে।

এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন ও গৃহকর্মী নির্যাতন

বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৫ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা কিছুটা কমে এসেছে। ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যেখানে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন যথাক্রমে ৬৮, ৪৪ ও ৪৮ জন নারী। সেখানে ২০১৫ সালে মোট ৩৫ জন নারী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৮টি ঘটনার ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে। অপরদিকে ২০১৫ সালে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ২৯৮ জন নারী এবং মামলা হয়েছে ১৫৮টি। এ বছর পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ৩৭৩ জন, যার মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে ১৪৬টি। ২০১৫ সালে নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় মোট ৬৩ জন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে ২২টি ঘটনার মামলা হয়েছে। তবে আশার দিক হচ্ছে এ বছরে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়, যাতে গৃহকর্মীদের অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

শিশু নির্যাতন

বছরের মাঝামাঝি সময়ে শিশু নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পায়। নির্যাতনের মাত্রা ও ধরণে নিষ্ঠুরতা ছিল ভয়াবহ। ৮ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত ৭ দিনে ৭টি শিশু হত্যাকান্ডের শিকার হয়। ৮ জুলাই সিলেটে পৈশাচিক নির্যাতনে শিশু রাজন হত্যা ও ভিডিও চিত্র ধারণ করে ফেসবুকের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া এবং ৩ আগস্ট খুলনায় শিশু রাকিবকে হত্যার ঘটনা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। ২ অক্টোবর গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সরকারদলীয় সাংসদ কর্তৃক চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র শাহাদত হোসেন সৌরভের গুলিবিদ্ধের ঘটনা দেশব্যাপী তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এছাড়া বছরের শুরুতে

রাজনৈতিক সহিংসতায় শিকার হয়েছে শিশুরাও। ২০১৫ সালের প্রথম দেড় মাসে হরতাল ও অবরোধে সংঘটিত সহিংসতায় ১১ জন শিশু নিহত হয় ও ১২ জন শিশু আহত হয়। আসকের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট ও শিশু অধিকার ইউনিটের তথ্য অনুযায়ী এ বছর ১৩৩ জন শিশুকে হত্যা করা হয়। ২০১৪ সালে হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিল ৯০ জন শিশু। উল্লেখ্য, শিশুর প্রতি বর্বর নির্যাতন ও হত্যার বিষয়ে দেশব্যাপী অব্যাহত বিক্ষোভ-প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ে রাজন ও রাকিব হত্যা মামলার রায় দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক নির্যাতন

২০১৫ সালে বিভিন্ন সময়ে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা হত্যা, নির্যাতন, মামলা ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের তথ্যানুযায়ী ২০১৫ সালে তিনজন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১৮ জন সাংবাদিক। এছাড়া মোট ২৪৪ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ বছর সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল ফরিদপুরের সাংবাদিক প্রবীর শিকদারকে গ্রেফতার ও রিমান্ডে নেওয়ার বিষয়টি। অভিযোগ ওঠে যে প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থবিরুদ্ধ অবস্থান নেবার কারণে তাকে আটক করা হয় ও রিমান্ডে নেয়া হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিক সমাজের অব্যাহত প্রতিবাদের মুখে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। ২৪ ডিসেম্বর ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশে ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায় রংপুরের সাংবাদিক মসিউর রহমানের। ৭ জুলাই চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় সমকালের সাংবাদিক আবু সায়েম (৩৫) নিজ বাসায় খুন হন। এছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত সাংবাদিক আওরঙ্গজেব ২০ ডিসেম্বর নিখোঁজ হওয়ার চারদিন পর ২৩ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আওরঙ্গজেবের রহস্যজনক এই মৃত্যুর ঘটনায় তাঁকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর পরিবার।

শ্রমিক অধিকার

দেশে শ্রমিকের অধিকার লংঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিশেষ করে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশ শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বেসরকারি সংগঠন সেইফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির জরিপ থেকে জানা যায়, ২০১৫ সালে কর্মক্ষেত্রে ২৮২টি দুর্ঘটনায় মোট ৩৭৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে নিহত হয়েছেন ১০ জন শ্রমিক। ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার মিরপুরে প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১৪ জন শ্রমিক নিহত হন। এছাড়া বাগেরহাটের মংলায় সিমেন্ট ফ্যাক্টরির নির্মাণাধীন ভবন ধসের ঘটনায় ৬ জন নিহত ও প্রায় ১০০ জন আহত হওয়ার ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য।

আশার কথা হচ্ছে, সরকার এ বছর ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রম বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। শ্রম আইন বাস্তবায়নে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করছি। রানাপ্লাজার ঘটনায় আহত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টির পুরোপুরি সমাধান হয়নি। তবে রানাপ্লাজা ডোনারস ট্রাস্ট ফান্ড থেকে আহত শ্রমিক, নিহত শ্রমিকের পরিবারকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রানা প্লাজার ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়ায় ধীরগতি লক্ষ্য করা গেলেও এবছর মামলার চার্জশীট দেয়া হয়েছে।

আদিবাসীদের অধিকার

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলে নি এখনও। ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি এবং পার্বত্য ভূমি কমিশনের কার্যক্রমও কার্যত থেমে আছে। পার্বত্য অঞ্চলে ও সমতলে আদিবাসীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, হয়রানি, ভূমি দখল ও উচ্ছেদের অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২৪ জানুয়ারি সকালে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার বড়দল সরকারপাড়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এক বাঙ্গালী নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাঙ্গালীরা আদিবাসীদের ৫৫টি বাড়িতে ভাংচুর-অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে আদিবাসীর বাড়ি দখল ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। বসতভূমি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে নওগাঁর পত্নীতলায় প্রকাশ্য দিবালোকে এক আদিবাসী বালককে গুলি করে হত্যা করে উচ্ছেদকারীরা। এছাড়া ১৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলিতে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে নিহত হন সশস্ত্র পাঁচ আদিবাসী যুবক।

দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে আমরা সরকারের আরো কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করি। সরকারের কাছে জনগণের যে প্রত্যাশা থাকে সে অনুযায়ী সরকারের উচিত মানবাধিকারের একটি সর্বজনগ্রাহ্য মান বজায় রাখা। কিন্তু আমরা প্রায়শ লক্ষ্য করি, ক্ষমতাসীনরা বিগত সরকারের সমালোচনা করে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে বিরোধীদলও কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন না করে শুধুমাত্র সরকারের সমালোচনা করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। আমরা আশা করি এই প্রবণতা কাটিয়ে উঠে সরকার ও বিরোধীদল উভয় পক্ষই মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।